



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - vi, Issue - i, Published on January issue 2026, Page No. 843 - 847

Website: <https://tirj.org.in/tirj>, Mail ID: editor@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 – 0848

গাজন : বাংলার লোকসংস্কৃতির ইতিহাসের একটি পর্যালোচনা

ড. অভিজিৎ সিংহ

সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ

কান্দরা রাধাকান্ত কুণ্ডু মহাবিদ্যালয়

Email ID: singha1207@gmail.com

ID 0000-0002-1565-3739

Received Date 20. 01. 2026

Selection Date 10. 02. 2026

Keyword

Shiva, Garjan,
Neel Brata,
Chaitra
Sankranti,
Bagdi,
Gambhira,
Baanfora,
Rabindranath.

Abstract

Among the various festivals related to the greatness of Shiva that are prevalent in Bengali society, Gajan is one of them. The word Gajan is derived from the word Garjan. The Gajan festival primarily consists of three parts: Ghata Sannyas, Neel Brata, and Charak. Previously, devotees would observe Sannyas starting from the first day of Chaitra. Now, some strictly adhere to rules seven days prior to Chaitra Sankranti, while others do so three days in advance. In Gajan, the priest, known as Deyasi, is selected from among the marginalized communities such as, Dom, Bagdi, Dhibor, and Tanti etc. Depending on the region, Gajan is known by various names; for example, it is referred to as Argi Puja in some places, Neel Puja in others, and Gambhira in some areas. However, despite these different names, the main characteristic of this festival remains the same. During these days, the sannyasis perform various rituals and ceremonies. Apart from Gajan-related activities like Baanfora, Jhap, and Charak Ghora, there exists a broader visual representation. It can certainly be said that Gajan is a bearer and carrier of our ancient culture. The tales of people's lives in Bengal are vividly reflected in festivals like Gajan. In Rabindranath's words, this history of folk life is the true history, where the lively history of living people resides.

Discussion

বাঙালির উৎসব আনন্দের মাঝে আত্মপীড়নের আকৃতিও ধর্ম-সংস্কৃতির অঙ্গ। সংস্কৃতির এই ধারা সাধারণের কাছে অন্তঃপ্রবাহী হয়ে কৃষি সংস্কৃতির সঙ্গে জড়িয়ে আছে। দেবতা শিবের আরাধনায় গাজনের সাড়স্বর রূপের বিস্তার বাংলায় কমবেশী সর্বব্যাপী। তাই আঞ্চলিক বিভিন্নতায় রীতিনীতিতে প্রভেদ থাকলেও, শিবগাজন একান্ত ভাবে সাধারণ মানুষের হয়ে উঠেছে। বাংলার গাজনউৎসবের এই ধারা একমুখী নয়। শিবগাজনের বহুমান্য ধারা ছাড়াও ধর্মরাজ, মনসা, শীতলা, বলরাম, ভগবতী, রতনমালা গাজনেরও স্বতন্ত্র বর্ণনা গাজনসংশ্লিষ্ট নাচ-চর্চার নতুন অভিযুক্ত তৈরি করেছে। আবার গাজন-, গান, নাটক, মেলা নিয়ে যে সার্বিক আবহ তা গ্রাম-সংস্কৃতির এক অনন্য ছন্দোবদ্ধ প্রকাশ। ছো, সঙ, গম্ভীরা, গমীরা, বোলান ইত্যাদি কত বঙ্গীয় সংগীত-নৃত্য-নাট্যধারা মিশে থাকে গাজনের সঙ্গে গাজন-সংশ্লিষ্ট বাগফোঁড়া, ঝাঁপ, চড়ক ঘোরা ইত্যাদির আচারঅনুষ্ঠান- ছাড়াও আছে এক ব্যাপ্ত দৃশ্যায়ন।^১

শিবের মাহাত্ম্য বিষয়ক যে সমস্ত অনুষ্ঠানগুলি বাংলার মানব সমাজে প্রচলিত রয়েছে গাজন তাদের মধ্যে ছিল অন্যতম। এর মধ্যে দিয়ে একদিকে বাংলার সমাজ, সংস্কৃতি, প্রকৃতি, পরিবার, আচার, ব্যবহার, ধর্ম, বিশ্বাস, স্থান-কাল-পাত্র ইত্যাদি সমস্ত কিছুই প্রতিচ্ছবি খুঁজে পাওয়া যায়।

বাংলার প্রায় সব রাজ্যেই চৈত্র মাসের বিভিন্ন সময় ভিন্ন ভিন্ন রীতিতে গাজন উৎসব পালিত হয়। উৎসব উপলক্ষে কেউ কেউ শিবের সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানটি মোটামুটি তিন-চার দিন পালিত হলেও কোথাও কোথাও সারা মাস ব্যাপী অনুষ্ঠান পালিত হয়। তবে মূল অনুষ্ঠান হয় একমাত্র চৈত্র সংক্রান্তির দিন। গাজনে অংশগ্রহণকারী সন্ন্যাসীগণ অনুষ্ঠানে দিনগুলিতে শিবের অসম্ভব শক্তি ও অপার কৃপাকে স্মরণ করে বিভিন্ন প্রদর্শন করেন। কাঁটাঝাঁপ, ঝাঁপবাণ, পার্শ্ববাণ, কপালবাণ, আগুননাচ, মাথাচালা, মানিকবেড়, দণ্ডডাক, বেতভাঙা, আগুনঝাঁপ, প্রভৃতি বিপজ্জনক খেলা দেখানোর মূল উদ্দেশ্য প্রচলিত সংস্কার ও বিশ্বাসকেন্দ্রিক, যা বাংলার লোকসমাজের গভীরে বিদ্যমান। এই কয়েকদিন সন্ন্যাসীরা গৃহ পরিবার ত্যাগ করে শিবের মতোই সর্বহারা ছন্নছাড়া জীবন যাপন পালন করে। চৈত্র মাসের প্রখর গরমে বাংলার বিভিন্ন গ্রামগঞ্জে পালিত এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী সন্ন্যাসীরা ধুলো মাখা শরীর, স্বল্পবস্ত্র পরিধান দেখে সত্যি বাবার শিষ্য হিসেবে মনে হয়। তারা সকলে মিলে একত্র বা বিক্ষিপ্তভাবে গ্রামের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে খালি পায়ে যাতায়াত করে। সঙ সাজে, শিবের মহিমা প্রচার করে। এই সময় তারা কোন মাছ-মাংস ভক্ষণ করে না, একবেলা ফলমূল বা ভাত খেয়ে শিবের মতোই নিঃস্ব ভাবে জীবন কাটায়। একবারে অনুষ্ঠানের শেষে ফুল বেলপাতা নৃত্য-বাদ্য সহযোগে অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শিবের পূজা তারা সমাপ্ত করে সন্ন্যাস ব্রত ভঙ্গ করে।

বাংলার অধিকাংশ গ্রামগঞ্জে এইভাবেই গাজনের উৎসব পালিত হয়। তবে পূজো আচারও ব্রত সংকল্পের ভিত্তিতে গ্রামে গ্রামে অনুষ্ঠিত এই সন্ন্যাস ধর্মের মধ্যে কিছু পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। এদের মধ্যে মূলত তিন ধরনের সন্ন্যাসী দেখতে পাওয়া যায় কাঁটা সন্ন্যাসী, আগুন সন্ন্যাসী ও খেজুর সন্ন্যাসী।^২

গাজন শব্দটির উৎপত্তি গর্জন থেকে। কেউ কেউ মনে করেন সন্ন্যাসীদের হুঙ্কার রব শিবসাধনায় গাজন রূপেই প্রচলিত। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে প্রকৃতি খণ্ডে উল্লেখ মেলে - “চৈত্র মাস্যথ মাঘেবা যোহর্চ্চয়েৎ শঙ্করব্রতী। করোতি নর্ভনং ভজ্য বৈব্রানি দিব্যশিনম্। মাসং বাপ্যর্দ্ধমাসং বা দশ সপ্তদিনানি বা। দিনমানং যুগং সোহপি শিবলোক মহীয়তে।” এর অর্থ চৈত্রে কিংবা মাঘে এক-সাত দশ-পনেরো কিংবা তিরিশ দিন হাতে বেতের লাঠি নিয়ে শিবব্রতী হয়ে নৃত্য ইত্যাদি করলে মানুষের শিবলোক প্রাপ্ত হয়। পুরাণের এই উল্লেখ চড়ক কিংবা গাজন উৎসব রূপে পালিত হয়। আবার কারও মতে গাজন উৎসবে রয়েছে বৌদ্ধ প্রভাব। তেমনই বাংলার মঙ্গলকাব্যেও গাজনের উল্লেখ মেলে। যেমন ধর্মমঙ্গল কাব্যে উল্লেখ মেলে রানি রঞ্জাবতী ধর্মকে তুষ্ট করতে গাজন পালন করেছিলেন।

আধুনিকতা আর অবক্ষয় সংস্কৃতিতে যতই গ্রাস করুক না কেন, গ্রাম বাংলায় আজও দেখা যায় গাজনের বৈচিত্রপূর্ণ ছবি। চৈত্রের শুরু থেকেই ধ্বনিত হয় ‘বাবা তারকনাথের চরণে সেবা লাগে...’। এই সময় অন্ত্যজ শ্রেণির নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সন্ন্যাস পালন করেন। কেউ কেউ আবার শিব-পার্বতী সেজে হাতে ভিক্ষা পাত্র নিয়ে বের হন। সারাদিন বিভিন্ন স্থানে ঘুরে ঘুরে আতপচাল, রাঙালু, কাঁচাআম, কাঁচকলা এবং অর্থ সংগ্রহ করে সন্ধ্যায় তাঁরা পাক করা অন্ন গ্রহণ করেন।

গাজন উৎসবের মূলত তিনটি অংশ— ঘাট-সন্ন্যাস, নীলব্রত ও চড়ক। আগে মূলত চৈত্রের প্রথম দিন থেকেই ভক্তরা সন্ন্যাস পালন করতেন। এখন কেউ চৈত্র সংক্রান্তির সাত দিন আগে, কেউ বা তিন দিন আগে থেকে কঠোর নিয়ম পালন করেন। সন্ন্যাস পালন করা হয় বলে গেরুয়া বস্ত্র ধারণ, হবিষ্য গ্রহণ আবশ্যিক। একটি দলের মধ্যে একজন মূল সন্ন্যাসী এবং একজন শেষ সন্ন্যাসী রূপে গণ্য হন। উৎসবে এই দু’জনেরই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে। বাংলার এক এক প্রান্তে দেখা যায় গাজনের আঞ্চলিক বৈচিত্র।

গাজন উৎসবের সূচনা নিয়ে লোককথায় শোনা যায় নানা কাহিনি। শোনা যায়, বান রাজা ছিলেন শিবভক্ত। তিনি শিবকে তুষ্ট করতে কৃচ্ছসাধনের মধ্য দিয়ে তপস্যা করেছিলেন। তারকেশ্বরে, চুঁচড়ার ষাণ্ডেশ্বরতলায়, নদিয়া জেলার বিভিন্ন স্থানে, বর্ধমান, জয়নগর ইত্যাদি নানা জায়গায় হয় গাজন। মালদহ জেলার গম্ভীরা উৎসব কোথাও হয় চৈত্র সংক্রান্তিতে

কোথাও বা পয়লা বৈশাখে। চার দিনের এই উৎসবে এক দিকে যেমন শিব আরাধনা হয় ঠিক তেমনই গানের মাধ্যমে দৈনন্দিন জীবনের নানা সমস্যার কথা শিবকে জানানো হয়। সেখানে রাজনীতি থেকে জীবনের নানা বঞ্চনা বাদ যায় না। এই উৎসবে প্রথম দিন ঘটভরা, দ্বিতীয় দিন তামাশা, তৃতীয় দিন বড় তামাশা আর চতুর্থ দিন আহার। তবে জেলাগুলির পাশাপাশি আজও কলকাতায় বের হয় চৈত্র সংক্রান্তির সঙ। তার মধ্যে প্রথমই মনে আসে জেলে পাড়ার সঙ-এর কথা। এ ছাড়া দক্ষিণ কলকাতার ভবানীপুরেও সঙ বের হয়। দিন বদলেছে। বদলেছে গাজনের কিছু কিছু আচার অনুষ্ঠান, তবুও বদলায়নি সরল লোকবিশ্বাস আর পার্বণের আকর্ষণ।^৭

‘...পদ্মের ফুলে তুষ্ট আমার অমিয় সাগর।

ধুতরার ফুলে তুষ্ট আমার সন্ন্যাসী নাগর॥

কালীদহে তুল্লাম ফুল জাহ্নবীতে ধুলাম।

গঙ্গাজলে শুদ্ধ ফুল গাজনে আনিলাম॥...’

চৈত্র মাসে গাজন উৎসবের আগের রাতে পাটঠাকুর বা শিবের সিংহাসন জাগরিত করতে নদিয়া-যশোরে এই ফুলশুদ্ধি ছড়ার প্রচলন। তারপর শুরু হয় ‘খাটনিবাধূপচি’ নৃত্য। দ্বি-প্রহর রাতে শ্মশানে হাজরা ঠাকুরের ভোগ প্রেরিত হওয়ার পর পূজোর সূচনা। ঢাকের বাদ্যি, ভোলা মহেশ্বরের নামে সন্ন্যাসীদের গর্জন ও গাজনগীতিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে ওঠে। বাঙালি মেতে ওঠে গাজন উৎসবে। হিন্দু সমাজের ঐতিহ্যনুযায়ী চৈত্রমাস হল শিব-পার্বতীর বিবাহের মাস। এই মাসেই তাই গাজনের ধুম।^৮

এই গাজন উৎসবের সঙ্গে বাঙালিদের সম্পর্ক ও এই উৎসবের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য উৎপত্তি এবং বিকাশ লাভ নিয়েই এখানে আমরা আলচনা করবো। প্রয়াত লোক সংস্কৃতিবিদ আশুতোষ ভট্টাচার্য্য মনে করেন ‘গাজন আসলে, আদিম সমাজের বর্ষাবোধন উৎসব।’^৯ গাজন উৎসবকে শিবের বিবাহ উৎসব হিসাবে গ্রহণ করা হয় সর্বত্র।^{১০} তিনি আরও বলেন যে, গজ্জন শব্দের মূলে ‘গাঁ-জন’ অর্থাৎ গ্রাম জনের উৎসব।^{১১} তার মতে ‘গজ্জন’ শব্দ থেকে গাজন হয়েছে।^{১২} এই গাজনে কারা অংশগ্রহণ করে? এর উত্তরে বলা যায় এই উৎসবে গ্রামের সবাই অংশ নিতে পারে কিন্তু ব্রাহ্মণ্য আধিপত্য বর্জিত হাঁড়ি, ডোম, বাগদী, ধীবর, তাঁতিদের মধ্যে থেকে দেয়াসী অর্থাৎ পূজারি হয়। পূজারিরা ভিন্ন জাতের হলেও পূজোর সময় উৎসবকালে তাদের ভক্ত হতে হয়। তারা ধড়া (যজ্ঞপোবীত) গলায় পরে এবং ব্রাহ্মণদের মতো আচার নিষ্ঠা পালন করে, শিবগোত্র গ্রহণ করে।^{১৩} একটু আগে আমরা দেখেছি এই গাজনের মূল ভক্তা প্রধানত অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষ থেকে উঠে আসে এবং গাজনের দিন এই ভক্তাকেই স্বয়ং শিবের প্রতিভূ বলে মনে করা হত বলে তথাকথিত উচ্চবর্ণের মানুষরা সেইদিন ভক্তাদের প্রণাম করে কারণ তারা যদি কিছু পুণ্য অর্জন করতে পারে। পল্লব সেনগুপ্ত মনে করেন চড়কের সময় পিঠে বানফোঁড়া, গড়াগড়ি খাওয়া, চড়কে হুক লাগিয়ে ঘোরা, কাঁটার উপর ঝাঁপ দেওয়া এগুলো সব ছিল কষ্টসাধ্য ব্যাপার।^{১৪}

গাজন বলতে মূলত শিব গাজন ও ধর্মের গাজনই বুঝি। এখন এখানে আমি সংক্ষেপে এই দুই ধরনের গাজন নিয়েই বলবো। বাঙ্গালীর ইতিহাস গ্রন্থে নীহাররঞ্জন রায় বলেছেন, শিব পূজো বহু প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত আছে। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে এই দেবতাকে কৃষকের দেবতা রূপে অভিহিত করা হয়েছে। ধর্ম ও চড়কপূজোকে প্রাচীন ‘কোমের’ ভূতবাদ ও পুনর্জন্মবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত বলে অনেকে মনে করেন। প্রত্যেক কোমের মৃত ব্যক্তিদের পুনর্জন্ম কামনা করে এই দুটি পূজোর বাৎসরিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। শরীরের উপর নানারূপ যজ্ঞা দিগে বাণ ফোঁড়ার মতো যেসব বহুবিধ অনুষ্ঠান হত, তার মধ্যে প্রাচীন সমাজের নরবলি প্রথার স্মৃতি বিদ্যমান বলেই কোন পণ্ডিতের ধারণা।

শিবের গাজনে সর্বাধিক বন্দোবস্ত করে থাকেন ‘মণ্ডল/ মাহাত/ সর্দার’। ইনিই প্রধান। প্রধানত অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষই এই গাজন উৎসবের সঙ্গে সরাসরি জড়িত। প্রত্যেক গাজনে একজন মূল ভক্তা থাকে। মূলত তার নেতৃত্বেই বাকি ভক্তরা পরিচালিত হত। ভক্তদের হবিষ্যজাগরণ, ফল, উপবাস প্রভৃতি বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠান করতে হয়। আগে যেরকম ভাবে একমাস ধরে এই রকম আচার করতেন ভক্তরা তা ক্রমশ কমে গেছে সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে।

ভক্তাদের নানা নিয়ম কানুন মেনে চলতে হত। দাড়ি গোঁফ কামিয়ে মূল সন্ন্যাসীসহ অন্যান্য স্নান শেষে ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের সাহায্যে উপবীত ধারণ করে এবং মন্ত্রোচ্চারণের মধ্য দিয়ে নিজে গোত্র থেকে দেবগোত্রে

গোত্রান্তরিত হয়। প্রত্যেকের হাতে থেকে বেতের ছড়ি। এই কয়দিন সন্ন্যাসীদের উপবাস চলে। এরা সকাল থেকে কিছু খাবার গ্রহণ করে না, কেবল রাতে পুজোর পর হবিষ্যাম ও ফলমূল গ্রহণ করে থাকে। এই কয়দিন সন্ন্যাসীদের নানা কৃচ্ছসাধনা করতে হয়। অঞ্চলভেদে বিভিন্ন নামে গাজন পরিচিত ছিল যেমন কোথাও এটি অর্গি পুজো, কোথাও নীল পুজো, কোথাও গম্ভীরা নামে এটি পরিচিত ছিল। কিন্তু বিভিন্ন নামে পরিচিত হলেও এই উৎসবের মূল বৈশিষ্ট্য কিন্তু একই ছিল। মূলত এই কয়দিন সন্ন্যাসীরা বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান পালন করে থাকে। প্রতিদিন সন্ন্যাসীরা ফুল বেলপাতা দেবতার মাথায় ও ঘটে চাপায়। ঐ ফুল, বেলপাতা দেবতার মাথা বা ঘট থেকে নীচে পড়লে দেবতা সন্তুষ্ট হয়েছে এবং অনুমতি করেছে বলে মনে করা হয়। একে বলা হয় ভুল কাড়ান। যদি এই ফুল না পড়ে তখন সন্ন্যাসীরা বা ভক্তরা মন্দির সংলগ্ন প্রাঙ্গণে হাত চালান করে ক্ষমাপ্রার্থনা করে থাকে। এরফলে দেবতা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয় এবং অবশেষে দেবতার মাথা বা ঘট থেকে ফুল পড়ে। এরপর চলে অন্যান্য অনুষ্ঠান।

ভক্তদের দাঁড়ি, ঘোফ কামিয়ে স্নান শেষে ব্রাহ্মন পুরোহিতের সাহায্যে উপবীত গ্রহণ করে মন্ত্রচ্চারনের দ্বারা দেবতাদের গোত্রে রূপান্তরিত হয়ে যাওয়া। এছাড়া প্রত্যেক ভক্তের হাতে থাকতো বেতের ছড়ি। এই কদিন ভক্তদের উপবাস করতে হয়। স্নান করার পর দণ্ডী কেটে পথ পরিক্রমা করে মানত করত মানতকারীরা ও ভক্তারা। অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র এই শিবের গাজনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল চৈত্র মাসে শিবের আরাধনার মাধ্যমে যাতে কৃষিজীবী মানুষরা সারা বছর সুস্থ সবলভাবে কৃষিকাজ করতে পারে ও শারীরিক কৃচ্ছসাধনের মাধ্যমে সারা বছর সুস্থ সবলভাবে থাকতে পারবে এবং উৎপাদিত ফসলের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে। তাদের কাছে এই শারীরিক নীপিড়ণ ঐ বৃহৎ স্বার্থেই যেন কিছুই নয়, এযেন তাদের এক সামান্য অঙ্গীকার সারা বছর সুখে থাকা ও ভালো থাকার জন্য। বলা বাহুল্য যে এই কামনাতেই পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলাতে যেসব গাজন উৎসব সে যে নামেই হয়ে থাকুক না কেন উদ্দেশ্য কিন্তু প্রায় এক। তাই কৃষি বৎসরের শুরুতে শরীরকে ভগবানের উদ্দেশ্যে নিবেদন করে কঠোর এই কৃচ্ছসাধনের মধ্য দিয়ে।^{১১}

এখন ধর্ম গাজন নিয়ে কিছু কথা বলবো। অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, ‘ধর্মঠাকুর এমন একটি মিশ্র দেবতা যাঁহার মধ্যে বৈদিক ধর্মপ্রচার প্রাচীন আর্যতর সংস্কার ব্রাত্য শৈব-ধর্ম নাথধর্ম এবং ব্রাহ্মন সংস্কৃতির বিষ্ণু উপাসনার সঙ্গে ধর্ম উপাসনা এক হয়ে গেছে। সুকুমার সেন বলেছেন, - ধর্মঠাকুরের পূজো চলে এসেছে এদেশের তথাকথিত নিম্নস্তরের জনগণের মধ্য দিয়ে। ধর্ম ঠাকুরের পূজোয় বহু লোকজনের আবশ্যক, তিনি বহু লোকের পূজ্য সার্বজনিক দেবতা, ব্যক্তির উপাস্য মাত্র নন। আর তার পূজক হাড়ি-ডোম-চণ্ডাল প্রভৃতি অন্ত্যজ ব্রাহ্মন জাতি। সুতরাং ব্রাত্য তো বটেই।^{১২} নীহাররঞ্জন রায়ের মতে ধর্মঠাকুর মূলত ছিলেন প্রাক আদিবাসী কোমের দেবতা। আজও ধর্মপূজোর প্রধান আধিকারি ডোমরা, যদিও এখন কৈবর্তরা, শূঁড়ি, বাগদী, ধোপা প্রভৃতিদের ভিতর ও ধর্মপণ্ডিত বা ধর্মপুরোহিত বিরল নয়।^{১৩} এই ধর্ম গাজন অঞ্চলভেদে কিছুটা আলাদা হলেও প্রধান উৎসব প্রায় এক ছিল। বাণ খেলা, ফুলকাড়ান, আগুনে ঝাঁপ দেওয়া ইত্যাদি ছিল এই উৎসবের প্রধান অঙ্গ।^{১৪}

গাজন আমাদের প্রাচীন সংস্কৃতির ধারক ও বাহক একথা অবশ্যই বলা যায়। বাংলার লোকজীবনের গল্পগাঁথা এই গাঁজনের মত উৎসবেই ফুটে ওঠে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় এই লোক জীবনের ইতিহাসই হল প্রকৃত ইতিহাস। সেখানে থাকে সজীব মানুষের সজীব ইতিহাস। এই ইতিহাসে আমরা খুঁজে পাই সমাজের একদম নিচু স্তরের মানুষের সুখ-দুঃখ, ভালোলাগা, সমাজ ও সংস্কৃতির ইতিহাস। প্রকৃতপক্ষে এরাই হল সমাজ ব্যবস্থার ধারক ও বাহক।

গাজন উৎসবের মূল অনুষ্ঠানগুলির প্রধানত কৌম সংস্কারজাত উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধি, বৃষ্টির জন্য কামনা প্রভৃতি থেকে বর্তমানে শুষ্ক আচারে পরিণত হয়েছে। গাজন উৎসবে ভক্তরা তাদের বিভিন্ন দুঃখ দুর্দশা লাঘব করার জন্য বিভিন্ন দৈহিক পীড়ন ও শারীরিক কৃচ্ছসাধন করে থাকেন। কিন্তু এই ধর্মীয় ক্রিয়া-কলাপের মধ্যে যে সামাজিক মূল্যবোধ লুকিয়ে রয়েছে বিভিন্ন আচারকৃত ক্রিয়াগুলিকে ভালো করে সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণে দেখলেই বোঝা যাবে। এখানে অন্য একটি বিষয় যা অবশ্যই লক্ষণীয় তা হল আমরা প্রতিনিয়ত যেখানে আমাদের সংস্কৃতিকে ভুলতে বসেছি বা হারাতে বসেছি সেখানে এই ধরনের কিছু অনুষ্ঠান ও সেখানে অংশগ্রহণকারী মানুষজন যারা এখনো তাদের কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে পুরনো সংস্কৃতিকে ধরে রেখেছেন। আর এখানেই গাজনের প্রাসঙ্গিকতা বর্তমান দিনেও যে ব্যাপক ভাবে রয়েছে আমাদের লোকজীবনে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

Reference:

১. অধিকারী, মনোজিৎ, গাজন, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০২১
২. <https://www.anandabazar.com/west-bengal/special-write-up-on-gajan-dgtl-1.358908>
৩. রায় চৌধুরী, ড. পিন্টু, কালের দর্পণে বাংলা প্রবন্ধ, কলকাতা, ২০১৫
৪. <https://www.anandabazar.com/rabibashoriyo/unknown-facts-about-gajon-festival-of-rural-areas/cid/1420988>
৫. অধিকারী, মনোজিৎ, গাজন, লোকশ্রুতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, জুলাই, ২০১৮
৬. করণ, সুধীর কুমার, সীমান্ত বাংলার লোকযান, আশাদীপ, কলকাতা, ২০১৩, পৃ. ৫২
৭. তদেব, পৃ. ৫৫
৮. ঘোষ, বিনয়, পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩২
৯. অধিকারী, মনোজিৎ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০
১০. সেনগুপ্ত, পল্লব, লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ, বিপণী পুস্তক, কোলকাতা, ২য় প্রকাশ, ২০০২
১১. অধিকারী, মনোজিৎ, গাজন, লোকশ্রুতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলকাতা, জুলাই, ২০১৮, পৃ. ৩৫-৩৬
১২. তদেব, পৃ. ৩৯
১৩. রায়, নীহাররঞ্জন, বাঙ্গালির ইতিহাস, স্বাক্ষরতা প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৮০, পৃ. ৬১৬
১৪. অধিকারী, মনোজিৎ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪০